Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 22-28
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.078

দ্বৈততত্ত্ব: সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যায় অভিব্যক্তিবাদ

অজিত টুডু, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.04.2026; Accepted: 29.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

At present, human civilization, having ascended to the pinnacle of intellectual inquiry, seeks to bring everything under its control. Yet, conversely, it remains an undeniable truth that providing a definitive explanation for the genesis of this universe has proven elusive. Across mythological, scientific, and folkloric traditions, diverse explanations regarding the origin and evolution of the cosmos can be found. Within the Sāṅkhya, an ancient school of philosophy, the sage Maharṣi Kapil offered an elegant exposition on the evolution of the world. In this framework, Kapil Muni describes the origin of the universe through the interplay of two fundamental principles: Prakṛti (Nature) and Puruṣa (Consciousness). He identifies Prakṛti as the material cause of this universe and elucidates the process of evolution based on the principle of cause and effect. In Sāṅkhya philosophy, this causal principle is known as Satkāryavāda. In characterizing the essential nature of Prakṛti, Kapil describes the Triguṇa-s, the three fundamental qualities: Sattva, Rajas, and Tamas. Kapil Muni explains that evolution ensues when the equilibrium of Prakṛti is disturbed; conversely, the evolutionary process of the universe ceases once Prakṛti returns to a state of equilibrium. Maharṣi Kapil further asserts that all evolutionary transformations pertain solely to Prakṛti; Puruṣa remains entirely exempt from such evolution. Indeed, within the Sāṅkhya system, the concept of evolution is primarily elucidated in the context of Puruṣa's attainment of Kaivalya (absolute liberation). Once Puruṣa achieves Kaivalya, the evolutionary process of Prakṛti comes to a halt. The evolution of Prakṛti remains confined within its own sphere, and the transformations that occur therein are collectively termed Pariṇāmavāda.

Keywords: Prakṛti, Puruṣa, Satkāryavāda, Guṇa:(Sattva, Rajas, Tamas) Pariṇāmavāda

এই মহা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? কিভাবে এই মহাবিশ্ব নিজেকে ক্রমাগত বিস্তার ও প্রসার করে চলেছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায়নি তবে বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও ভূ-বিজ্ঞানীগণ জগতের উৎপত্তির বিষয়ে বহু তত্ত্ব প্রদান করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে জগতের উৎপত্তির অর্থাৎ অভিব্যক্তির বা বিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন,তবে কোন ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত একক সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়নি। তাই সমস্ত শাখা নিজ নিজ অবধারণাকে কেন্দ্র করে জগতের উৎপত্তির অর্থাৎ অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের রহস্যকে উন্মোচন করার চেষ্টা করে চলেছেন। জীব ও জড় জগতের বিভিন্ন বৈচিত্র ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এই পরিবর্তন জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবর্তনের গতিকে লক্ষ্য করে ডারউইন জীব বিজ্ঞানে জীব বৈচিত্র্যের উল্লেখ করেছেন। হার্বার্ট স্পেনসারও

অনুরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের উল্লেখ করেছেন, তবে স্পেনসার শুধু জীব বিবর্তনের মধ্যে থেমে থাকেননি, তিনি জীব, প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যেও যে বিবর্তন হয়ে চলেছে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যাইহোক বর্তমান কালে বিবর্তনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রাচীন কালে পৌরাণিক গ্রন্থ সমূহে বিবর্তনের বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়, এর মধ্যে অন্যতম একটি দর্শন সম্প্রদায় কপিল মুণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাংখ্য দর্শনেও বিবর্তনের এক যৌক্তিক বিবরণ পাওয়া যায়। কপিল মুণি তার সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (চেতন) এই দুটি তত্ত্বকে মৌলিক হিসেবে স্বীকার করে মহাবিশ্বের বির্বতনের বা অভিব্যক্তির দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যা বিশ্বের প্রথম বির্বতনের বা অভিব্যক্তির যুক্তিযুক্ত মতবাদ রূপে মনে করা হয়।

মহর্ষি কপিলের পরিচয়:

ভারতীয় দর্শনের প্রাচীনতম শাখাগুলোর মধ্যে সাংখ্য দর্শন অন্যতম এবং এই দর্শনের প্রবর্তক হলেন মহর্ষি কপিল। তিনি 'আদিবিদ্বান' নামেও পরিচিত। পৌরাণিক ও দার্শনিক উভয় প্রেক্ষাপটেই মর্হর্ষি কপিল একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। মনে করা হয়ে থাকে, তিনি প্রাচীনকালে ভারতের বৈদিক যুগের সমসাময়িক অথবা তারও পরবর্তী কোনো এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুসারে, মহর্ষি কপিল হলেন প্রজাপতি কর্দম মুনি ও দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দেবহূতির সন্তান। আবার এমনও প্রচলিত আছে যে, কপিল মুনির নামের সাথে গঙ্গা মর্ত্যে আসার কাহিনী গভীরভাবে জড়িত। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, রাজা সগরের ৬০ হাজার পুত্র অশ্বমেধের ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে কপিল মুনির আশ্রমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে মুনির ক্রোধাগ্নিতে তারা ভস্মীভূত হন। পরবর্তীকালে তাদের বংশধর ভগীরথ গঙ্গা নদীকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন যাতে কপিল মুনির দ্বারা অভিশপ্ত সগর-পুত্রদের আত্মা মুক্তি পায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকের দিনে অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গাসাগর মেলা, যেখানে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে হয়ে থাকে। তবে যাইহোক দার্শনিক আলোচনায় তিনি একজন যুক্তিবাদী ঋষি হিসেবেই পরিচিত। কপিল মুনি প্রথাগত ঈশ্বরকেন্দ্রিক চিন্তার বাইরে গিয়ে যুক্তিনির্ভর দর্শনের সূত্রপাত করেন।

তিনি মহাবিশ্বকে ২৫টি মূল তত্ত্বে বিভক্ত করেছেন এবং বলেন এর মূলে রয়েছে প্রকৃতি (জড় শক্তি) এবং পুরুষ (চৈতন্য)। তিনি এটাও প্রচার করেন যে জগত কোনো অলৌকিক শক্তি দ্বারা নয়, বরং প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বিবর্তিত হয়েছে। মানুষকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক— এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য তিনি তাত্ত্বিক জ্ঞানের পথ দেখিয়েছেন। তাকে 'সাংখ্যসূত্র' নামক আকর গ্রন্থের রচয়িতাও বলা হয়। যদিও মূল গ্রন্থটি এখন বিলুপ্তপ্রায়, কিন্তু তার প্রধান শিষ্য আসুরি এবং পরবর্তীকালে পঞ্চশিখ এই দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যান। পরে ঈশ্বরকৃষ্ণ তার 'সাংখ্যকারিকা' গ্রন্থে কপিলের মূল দর্শনকে সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে সংকলিত করেন। মহর্ষি কপিলের দর্শন যুক্তিবাদী চিন্তাধারায় প্রভাব ফেলেছিল। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন শক্তির নিত্যতা এবং বিবর্তনবাদের কথা বলে, তার বীজ মহর্ষি কপিল কয়েক হাজার বছর আগেই বপন করে গিয়েছেন। তিনি অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে 'কার্য-কারণ' তত্ত্বের ওপর জোর দিয়ে ছিলেন, যা তাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

ত্রিগুণ:

"প্রীতিপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥" সাংখ্যকারিকা- ১২ (শাস্ত্রী, ১৯৪৮, পৃ. ৩০)
"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" সাংখ্যকারিকা- ১৩ (শাস্ত্রী, ১৯৪৮, পৃ. ৩১)

সাংখ্য দর্শনের মূল ভিত্তি হল প্রকৃতি এবং পুরুষ। সাংখ্য মতে, সৃষ্টির মূল উপাদান হল 'প্রকৃতি', যা তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত। সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী, জগৎ প্রপঞ্চের মূলে থাকা 'প্রকৃতি' কোনো একক বস্তু নয়, বরং এটি তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা। এই গুণ গুলি হল: সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। সত্ত্ব গুণ হল গুণত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সত্ত্ব গুণ যখন প্রাধান্য পায়, তখন মানুষের মধ্যে জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং মন শান্ত থাকে। এটি জ্ঞান অর্জনে জন্য উপযুক্ত এবং মনের মধ্যে শান্তি, ধৈর্য ও আনন্দ বিরাজ করে। যখন সত্ত্বগুণ প্রাধান্য পায়, তখন মানুষ স্বচ্ছ চিন্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। রজোগুণ হল গতি ও চঞ্চলতার প্রতীক। এটি কর্মতৎপরতা, উত্তেজনা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে থাকে। রজোগুণের প্রভাবে মানুষের মধ্যে তৃষ্ণা ও আসক্তির আবির্ভাব হয়, যা তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। এটি দুঃখের অন্যতম একটি কারণ। তমঃ গুণ-কে জড়তা ও অন্ধকারের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এটি জ্ঞানকে আচ্ছন্ন বা আবৃত করে রাখতে পারে। এর ফলে আলস্য, নিদ্রা, মোহ এবং বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এটি মূলত সত্ত্ব ও রজঃ গুণের কাজকে বাধা প্রদান করে। সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী, এই তিনটি গুণ সবসময় একসাথে থাকে, যেমন প্রদীপের সলতে, তেল এবং আগুন মিলে একসাথে আলো দিয়ে থাকে। যখন এই তিনটি গুণের অনুপাত সমান হয়ে থাকে, তখন তাকে বলা হয় 'প্রকৃতি'। এই অবস্থায় কোনো সৃষ্টি বা আরম্ভ হয় না। আর যখনই কোনো একটি গুণ অন্য দুটিকে ছাপিয়ে যায় অর্থাৎ গুণ তিনটির সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়, তখনই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বা বিবর্তন শুরু হয় এবং জগতের বিচিত্র বস্তুর আবির্ভাব ঘটে।

প্রকৃতি ও পুরুষ-এর স্বরূপ:

"मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥" সাংখ্যকারিকা- ৩ (শাস্ত্রী, ১৯৪৮, পৃ. ৭)
"तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य।
कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च॥" সাংখ্যকারিকা- ১৯ (শাস্ত্রী, ১৯৪৮, পৃ. ৪২)

সাংখ্য দর্শনে মহর্ষি কপিল জগৎ সৃষ্টির দুটি মূল তত্ত্বের কথা বলেছেন— একটি হল প্রকৃতি (জড়) এবং অন্যটি হল পুরুষ (চৈতন্য)। প্রকৃতি যদি হয় পরিণামী বা পরিবর্তনশীল, তবে পুরুষ হয় অপরিণামী এবং নিত্য। সাংখ্য মতে প্রকৃতি হল জড় এর মধ্যে কোন চেতনা থাকে না। প্রকৃতি নিজেই নিজেকে জানতে পারে না। এটি সৃষ্টির মূল উপাদান কারণ হলেও এটি স্বয়ংক্রিয় নয়। এখানেই, স্পিনোজার দ্রব্য তত্ত্ব থেকে সাংখ্য দর্শন আলাদা,যেখানে স্পিনোজা বলেন দ্রব্য এক এবং এর দুটি গুণ আছে জড় ও চেতনা কিন্ত সাংখ্য দর্শনে দুটি মুল উপাদান প্রকৃতি এবং পুরুষ। প্রকৃতি হল জড় এবং পুরুষ হল চেতনা, আর এটি প্রকৃতি থেকে আলাদা উপাদান। তাই সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী। সাংখ্য দর্শন মতে জগতের সমস্ত প্রকার বস্তু— মন, বুদ্ধি, অহংকার থেকে শুরু করে পঞ্চভূত— সবই প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি এক এবং অবিভাজ্য, কিন্তু এর থেকে উৎপন্ন কার্য গুলো অসংখ্য। অর্থাৎ প্রকৃতি হল সমস্ত সৃষ্টির উপাদান কারণ।

সাংখ্য দর্শনে 'পুরুষ' শব্দটির অর্থ কোন সাধারণ মানুষ বা শারীরিক কোন সত্তা নয়। এখানে পুরুষ হল বিশুদ্ধ চেতনা। সাংখ্য মতে, পুরুষ কোনো জড় বস্তু নয়, এটি হল জ্ঞান বা চেতনার আধার। এটি স্বয়ংপ্রকাশ, একে প্রকাশ করার জন্য অন্য কোনো প্রকার আলো বা বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। জগতের সব কিছুই পুরুষের কাছে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পুরুষ নিজে কোনো কিছুর অংশ নয়। প্রকৃতি যেমন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, পুরুষ তেমন নয়। পুরুষের কোনো আরম্ভ বা শেষ নেই; এটি জন্মহীন (অজ), অবিনাশী এবং অক্ষয়। পুরুষ হলেন দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে, তাই এর কোনো ক্ষয় বা বৃদ্ধি ঘটে না। প্রকৃতির তিনটি গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) থাকলেও পুরুষ সম্পূর্ণ নির্গুণ। পুরুষ কোনো কাজ করে না, তাই সে অকর্তা। সে শুধুমাত্র একজন

সাক্ষী বা দ্রষ্টা। যেমন স্ফটিক মণির সামনে লাল ফুল রাখলে মণিটি লাল দেখায় যদিও প্রকৃত পক্ষে মণিটি রাঙা হয় না, তেমনি বুদ্ধি বা মনের সুখ-দুঃখ পুরুষে প্রতিফলিত হলেও পুরুষ প্রকৃতপক্ষে নির্লিপ্ত থাকে।

প্রকৃতি যেমন জড় ও পরিবর্তনশীল, অপরদিকে পুরুষ ঠিক তার বিপরীত- অপরিবর্তনীয়, নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য। সাংখ্যকার ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর গ্রন্থ 'সাংখ্যকারিকা'-তে পুরুষের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, *অ-ত্রিগুণাত্মক:* প্রকৃতি তিনটি গুণের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সমষ্টি নয়, পুরুষ আসলে গুণাতীত। পুরুষে কোনো জড় উপাদান নেই, তাই সে সুখ-দুঃখ বা মোহ দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয় না। দ্বিতীয়ত, *বিবেচক:* পুরুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে। এই বিবেকজ্ঞানই মোক্ষ বা মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। তৃতীয়ত, *অ-বিষয়:* প্রকৃতি হলো 'বিষয়' বা ভোগ্য, যা ভোগ করা যায়। কিন্তু পুরুষ হলো 'জ্ঞাতা' বা 'বিষয়ী'। সে কখনও কোনো কিছুর ভোগের বস্তু হতে পারে না। চতুর্থত, *চেতন:* পুরুষের সাধারণ ধর্মই হলো চেতনা। তার নিজস্ব কোনো আকার নেই, কিন্তু তার উপস্থিতিতেই জড় প্রকৃতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। পঞ্চমত, *অ-প্রসবধর্মী:* প্রকৃতি থেকে যেমন জগত সৃষ্টি হতে পারে, পুরুষ থেকে তেমন কিছু সৃষ্টি হয় না। পুরুষ কোনো কিছুর কারণ নয়, কোনো কিছুর কার্যও নয়। সাংখ্য মতে, পুরুষ মূলত অকর্তা। সে কোনো কাজ করে না, শুধু প্রত্যক্ষ করে, তাই তাকে সাক্ষী বলা হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির সান্নিধ্যের কারণে অবিদ্যার বশে বশীভূত হয়ে পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে এবং দুঃখ, কষ্ট ভোগ করে। যখন পুরুষের মধ্যে এই বোধের উদয় ঘটে যে, সে প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তখন সমস্ত দুঃখ,কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে। সাংখ্য দর্শনে একে বিবেকখ্যাতি বলা হয়। এই জ্ঞানের মাধ্যমেই পুরুষ জগত-সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজের আসল রূপে অর্থাৎ কৈবল্য অবস্থায় ফিরে যায়। মুক্ত অবস্থায় পুরুষ আনন্দময়ও নয়, আবার দুঃখময়ও নয়— সে কেবল এক নির্বিকার বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় সত্তা। অনেকটা অদ্বৈত বেদান্তর সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ন্যায়।

সাংখ্য দর্শনে পুরুষ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয় সেটি হল পুরুষ এক না বহু? এবং এটি সাংখ্য দর্শনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা পুরুষবহুত্ববাদ নামে পরিচিত। সাংখ্য মতে আত্মা বা পুরুষ এক নয়, বরং প্রতিটি জীবের জন্য পৃথক পৃথক পুরুষ বিদ্যমান। সাংখ্য সম্প্রদায় এক পুরুষের পরিবর্তে বহু পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ:

সাংখ্য মতে, পুরুষ একা কোনো কিছুর সৃষ্টি করতে পারে না কারণ সে নিষ্ক্রিয়। আবার প্রকৃতিও একা কোনো কিছুর সৃষ্টি করতে পারে না কারণ সে জড়। যখন পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি আসে, তখনই প্রকৃতির জড়তা কাটে এবং সৃষ্টির বিবর্তন শুরু হয়ে যায়। কপিল মুনি জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। প্রকৃতি জড় হলেও পুরুষের সান্নিধ্যে তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন অন্ধ ও খোঁড়া ব্যক্তি একে অপরের সাহায্যে জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে পারে, ঠিক তেমনি প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (চেতন) পরস্পর যুক্ত হয়ে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

বিবর্তনের ক্রম-বিন্যাস:

"प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः।
तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि॥" সাংখ্যকারিকা- ২২ (শাস্ত্রী, ১৯৪৮, পৃ. ৪৬)

সাংখ্য মতে প্রকৃতি থেকে মোট ২৩টি তত্ত্বের উদ্ভব হয়। বিবর্তনের এই ক্রম-বিন্যাস নিচে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হল: যখনই প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুরুষ চলে আসে তখনই প্রকৃতির মধ্যে সাম্যবস্থার বিঘ্ন ঘটে এবং তখন প্রকৃতির মধ্যে প্রথম যে বিবর্তন ঘটে তা হল মহৎ বা বুদ্ধি। এটি মহাজাগতিক বুদ্ধিতত্ত্ব। এখান

থেকেই ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি শুরু হয়। এরপর মহৎ বা বুদ্ধি থেকে অহংকারের উৎপত্তি হয়। এটি ব্যক্তির মধ্যে 'আমি'-বোধ বা অহংকারের সৃষ্টি করে। তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রাধান্য অনুযায়ী অহংকার তিন প্রকার হয়ে থাকে যথা— বৈকারিক (সাত্ত্বিক), তৈজস (রাজসিক) এবং ভূতাদি (তামসিক)। বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহংকার থেকে মন, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় যথা বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ উৎপন্ন হয়। ভূতাদি বা তামসিক অহংকার থেকে (পাঁচটি) পঞ্চতন্মাত্র যথা- শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্র বলতে সূক্ষ্ম ভূত সমূহকে বোঝানো হয়েছে। এরপর পঞ্চতন্মাত্র থেকে যথাক্রমে ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) এবং বোম্ (আকাশ)— এই পাঁচটি স্থূল ভূতের (পঞ্চভূতের) সৃষ্টি হয়। তৈজস বা রাজসিক অহংকারে যেহেতু রজঃ গুণের প্রাধান্য থাকে তাই এটি বৈকারিক (সাত্ত্বিক) ও ভূতাদি (তামসিক) এই দুই প্রকার উৎপত্তিতে শক্তির যোগান দেয়। সাংখ্য মতে, এই বিবর্তন বা অভিব্যক্তির পিছনে প্রকৃতির নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে 'পুরুষের' জন্য। এটি পুরুষের জাগতিক ভোগ এবং মোক্ষ বা মুক্তি এর একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন পুরুষ বুঝতে পারে যে সে প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন এবং মুক্ত, তখন প্রকৃতির কাজ শেষ হয় এবং বিবর্তন প্রক্রিয়া সেই পুরুষের জন্য থেমে যায়। সাংখ্য দর্শনের অভিব্যক্তি তত্ত্ব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এটি একটি সুশৃঙ্খল এবং যুক্তি নির্ভর বিবর্তন প্রক্রিয়া। যেখানে জড় প্রকৃতি থেকে চৈতন্যের সান্নিধ্যে বশত সূক্ষ্ম থেকে স্থূল বস্তুর আবির্ভাব ঘটে।

সৎকার্যবাদ:

"असत्करणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्॥" সাংখ্যকারিকা- ৯ (শাস্ত্রী, ১৯৪৮, পৃ. ২২)

আমরা জানি সব কিছু যা উৎপন্নশীল তা কার্য- কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ। যার থেকে উৎপন্ন হয় তাকে উপাদান কারণ এবং যেটি উৎপন্ন হয় তাকে কার্য বলা হয়। প্রকৃতি হল কারণ আর অভিব্যক্ত জগৎ হল কার্য। সাংখ্য দর্শনে যে বিবর্তন বা অভিব্যক্তির কথা আলোচনা হয়েছে তা কিন্ত কোন আকস্মিক ভাবে ঘটে না, এটি পুরোপুরি কার্য-কারণ নীতির ভিত্তিতে ঘটে যা সৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। এটি সাংখ্য দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। সাংখ্য মতে, কার্য ও কারণের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এই সৎকার্যবাদের মূল ভিত্তি হল- কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে সূক্ষ্ম অবস্থায় বর্তমান থাকে। 'সৎকার্যবাদ' শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত- একটি হল 'সৎ' অর্থাৎ যা বিদ্যমান এবং অন্যটি হল 'কার্য'। মূলত, কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেই তার কারণের মধ্যে 'সৎ' বা বিদ্যমান থাকে। সাংখ্যকার ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর 'সাংখ্যকারিকা' নামক গ্রন্থে এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার মতে, শূন্য বা অ-বিদ্যমান বস্তু থেকে কোনো কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ হল কার্যের অব্যক্ত রূপ, আর কার্য হল কারণের ব্যক্ত বা প্রকট রূপ। সাংখ্য দর্শনের এই সৎকার্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কয়েকটি যুক্তির উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলি নিম্ন রূপ:

অসদকরণাৎ: যা অসৎ বা বিদ্যমান নয়, তাকে কোনোভাবেই উৎপন্ন করা যায় না। যেমন- সোনার-পাথরবাটি কেউ তৈরি করতে পারে না। যদি কার্য কারণের মধ্যে আগে থেকেই বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তাকে হাজার চেষ্টা করেও অস্তিত্বে আনা যায় না। *উপাদানগ্রহণাৎ*: প্রতিটি কার্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট উপাদানের প্রয়োজন হয়। যেমন দই তৈরি করতে হলে দুধের প্রয়োজন হয়, মাটির পাত্রের জন্য মাটির প্রয়োজন হয়। যদি কার্য কারণের মধ্যে না থাকত, তাহলে যে কোনো বস্তু থেকে যে কোনো বস্তু তৈরি করা যেতে পারত, যেমন— বালু থেকে তেল তৈরি করা সম্ভব হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। *সর্বসম্ভবাভাবাৎ:* সব বস্তু থেকে সব

কিছু উৎপন্ন হতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট কারণ কেবল একটি নির্দিষ্ট কার্যই উৎপন্ন করতে পারে। এটি থেকে প্রমাণিত যে, কারণের মধ্যে কার্যের একটি বিশেষ শক্তি অব্যক্ত রূপে নিহিত থাকে। *শক্তস্য শক্যকরণাৎ;* কারণের মধ্যে যে কার্যটি উৎপন্ন করার 'শক্তি' থাকে, সেই কারণটি কেবল সেই কার্যকেই উৎপন্ন করতে পারে। আগুনের দহন শক্তি আছে তাই সে পোড়াতে পারে। এই শক্তিই প্রমাণ করে যে কার্যটি কারণের মধ্যে নিহিত। *কারণভাবাচ্চ;* কার্য ও কারণ অভিন্ন। কারণের মধ্যে যে ধর্ম বর্তমান থাকে, কার্যের মধ্যেও সেই ধর্ম বর্তমান থাকে। তিল থেকে যে তেল পাওয়া যায়, সেই তেলের গুণাগুণ তিলের মধ্যেও সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তাই কার্য হল কারণেরই রূপান্তর মাত্র।

সৎকার্যবাদের রূপ: পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ

সাংখ্য দর্শনের অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তন তত্ত্ব সৎকার্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সৎকার্যবাদ নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠে আসে সেটি হল এরকম যে, কারণ যখন কার্যে রূপান্তরিত হয় তখন কারণ কি সত্যি সত্যিই কার্যে পরিণত হয়, না কি কারণ কার্য রূপে প্রতিভাত হয়। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে কার্য-কারণ বিষয়ে দুটি মতবাদ এসে উপস্থিত হয় একটি হল পরিণামবাদ এবং অন্যটি হল বিবর্তবাদ। কারণ যখন কার্যে পুরোপুরিই রূপান্তরিত হয় তখন তাকে বলা হয় পরিণামবাদ। যেমন তিল থেকে তেল উৎপাদনের সময় তিল সত্যি সত্যি তেলে পরিণত হয়। আর যখন কারণ কার্য রূপে প্রতিভাত হয় তখন তাকে বিবর্তবাদ বলে। যেমন ব্রহ্ম যখন মায়া শক্তির দ্বারা জগৎ উৎপন্ন করে তখন ব্রহ্ম জগৎ রূপে প্রতিভাত হয়। সত্যি সত্যি জগৎ উৎপন্ন করে না। সাংখ্যরা সৎকার্যবাদের যে ব্যাখ্যা দেন তা হল পরিণামবাদ। অর্থাৎ তাদের মতে, কারণ-রূপ প্রকৃতি যখন কার্য-রূপ জগতে রূপান্তরিত তখন এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি মূলত প্রকৃতির সত্যি সত্যি রূপান্তর। সাংখ্য মতে, এই জড় জগত প্রকৃতিরই পরিণাম বা রূপান্তর। সৎকার্যবাদ যদি তত্ত্ব হয়, তবে পরিণামবাদ হল সেই তত্ত্বের প্রয়োগ বা প্রক্রিয়া। সাংখ্য মতে, 'প্রকৃতি' হলো জগতের মূল কারণ। যখন প্রকৃতির গুণত্রয় (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন সৃষ্টি হয় না। কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্যে যখন এই সাম্য বিঘ্নিত হয়, তখন প্রকৃতি পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এই রূপান্তরই হল পরিণাম। পরিণাম দুটি ধরণের সংঘটিত হয়: স্বরূপ-পরিণাম (সাদৃশ্য): যখন গুণগুলো নিজেদের মতোই থাকে (যেমন: মহৎ বা বুদ্ধি তার মূল সত্ত্বা বজায় রাখে)। বিরূপ-পরিণাম (বৈসাদৃশ্য): যখন গুণগুলো পরিবর্তিত হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করে (যেমন: প্রকৃতি থেকে মহৎ সৃষ্টি হওয়া)।পরিণামবাদ অনুযায়ী, জগৎ কোনো নতুন সৃষ্টি নয়, বরং প্রকৃতিরই একটি রূপান্তর মাত্র। দুধ যেমন দইয়ে পরিণত হয়, প্রকৃতিও তেমনই মহৎ, অহংকার ও পঞ্চভূতে পরিণত হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় মূল উপাদান (প্রকৃতি) একই থাকে, শুধু তার রূপ বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

সাংখ্য দর্শনের সৎকার্যবাদ কেবল একটি তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, এটি মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝার একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই তত্ত্বের মাধ্যমেই সাংখ্যকারগণ প্রমাণ করেছেন যে, সৃষ্টি মানে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া আবার বিনাশ মানে বিলুপ্তি নয়, বরং ব্যক্ত অবস্থা থেকে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যাওয়া। তিল থেকে তেলের উদাহরণ হোক বা বীজ থেকে বৃক্ষ— সৎকার্যবাদ থেকে এটাই বোঝা যায় যে সৃষ্টির বীজ সবসময় তার উৎসের মধ্যেই নিহিত থাকে।

উপসংহার:

বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে দাড়িয়েও জগত সৃষ্টির সঠিক তত্ত্ব এখনও পাওয়া যায়নি, গবেষকগণ বিভিন্ন ভাবে নিজদের দৃষ্টিকোণ থেকে বহু তথ্য প্রদান করে গেলেও কোন একটিকে পুরোপুরি সত্যরূপে স্বীকার করা যায় না। তবে এই সমস্ত মতবাদের সম্ভাব্যতাকে সত্য রূপে স্বীকার করে থাকি। আমাদের জ্ঞান-চর্চার বিভিন্ন শাখা আজও এই সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করার জন্য অনবরত গবেষণা করে চলেছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা

যেতে পারে যে জগত সৃষ্টির রহস্য শুধু বর্তমান যুগের আলোচনার বিষয় নয়, এই রহস্যের সমাধান করার সন্ধান বহু যুগ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ সাংখ্য দর্শনে পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে কপিল মুনি দুটি মৌলিক উপাদান বা তত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষ স্বীকার করেন এবং প্রকৃতিকে সৃষ্টির মূল কারণ এবং বৈচিত্রময় জগতকে কার্য রূপে আখ্যায়িত করেন। কপিল মুনির এই অভিব্যক্তিবাদ যাতে মনগড়া তত্ত্বে পরিণত না হয়। সেই জন্য এই মতবাদকে কার্য-কারণ তত্ত্বের নিরিখে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা সৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। পরিশেষে একথা বলা যেতেই পারে যে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের যে ধারণা সাংখ্য দর্শনে পাওয়া যায় তা ভারতীয় দর্শনে এক অনবদ্য স্থান অধিকার অর্জন করে আছে। অভিব্যক্তির আলোচনা সাংখ্য দর্শনের অন্যান্য মতবাদের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ।

তথ্যসূত্র:

১. চ্যাটার্জি, এস., এবং দত্ত, ডি. (১৯৬৮)। *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি* (৭ম সংস্করণ)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. চ্যাটার্জি, এস., এবং দত্ত, ডি. (২০০৭)। *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. ঈশ্বরকৃষ্ণ। (১৯৬৪)। *সাংখ্যকারিকা* (টি. জি. মাইনকার, অনুবাদক)। ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি।

৪. ঈশ্বরকৃষ্ণ। (১৯৭৩)। *দ্য সাংখ্যকারিকা অফ ঈশ্বরকৃষ্ণ* (এস. এস. এস. শাস্ত্রী, অনুবাদক)। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. ঈশ্বরকৃষ্ণ। (১৯৮২)। *দ্য সাংখ্যকারিকা অফ ঈশ্বরকৃষ্ণ* (এ. সেনগুপ্ত, অনুবাদক)। মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স।

৬. ঈশ্বরকৃষ্ণ। (১৯৯৫)। *সাংখ্যকারিকা* (স্বামী বিরূপাক্ষানন্দ, অনুবাদক)। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।

৭. শাস্ত্রী, এস. এস. এস. (১৯৪৮)। *দ্য সাংখ্যকারিকা অফ ঈশ্বরকৃষ্ণ*। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. শর্মা, সি. (১৯৯১)। *আ ক্রিটিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি*। মতিলাল বেনারসিদাস।

৯. VedicFeed. (2023, February 2). *Kapila Muni - Founder of the Samkhya philosophy.* Accessed 27 April 2026